খোলস

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

আমার ছেলেবেলায় মহকুমা শহরে যখন স্কুলে পড়তাম তখন নীলমণি মল্লিক মশায়কে দেখতাম দামী শাল গায়ে দিয়ে বেড়াতেন, শহরের একজন নামকরা উকিল। আমরাতখন তাঁকে ভয় করে চলতাম,আমাদের স্কুলে মাঝে মাঝে এসে তিনি আমাদের পরীক্ষাও নিতেন।

নীলমণি মল্লিক সে সময়ে শহরের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সকলে তাঁকে সম্মান করে, ভয় করে। নীলমণিবাবুর কাজকর্ম ঘড়ির কাঁটার মতো চলে। সকালে উঠে তিনি প্রাতভ্রমণে বার হবেন, ফিরবার পথে মুন্সেফবাবু ও মহকুমা হাকিমের বাড়ি ঘুরে কুশল জিজ্ঞাসা করে আসবেন। হয়তো বসে ওঁদের ওখানে এক পেয়ালা চা খেয়েও আসতে পারেন। এর নাম হাকিমকে তুষ্ট রাখা। এতে করে শহরে অনেক সুবিধে আছে, বিশেষ করে মহকুমার মতো জায়গায়, যেখানে এই হাকিমেরাই সব।

সেবারে দীনবন্ধু সেন ডেপুটি বাবুর মেয়ের বিয়েতে নীলমণিবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বিয়ের রাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনা থেকে আরম্ভ করে রান্নার চালায় গিয়ে মাছ-ভাজার তদারক করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে যেমন উৎসাহ নিয়ে করেছিলেন, মেয়ের বাপ দীনবন্ধু সেন ডেপুটিও তেমন করতে পারেননি।

পরের দিন বার লাইব্রেরিতে এজন্যে তাঁর সতীর্থ উকিল রামজয় বাঁড়ুজ্যে নাকি বলেন, কি হে, কাল কর্মকর্তা তুমি না দীনবন্ধুবাবু বোঝাই যাচ্ছিল না—

নীলমণিবাবু জানতেন তাঁর এই হাকিম-তোষণের নীতি অনেকে এখানে ভালো চোখে দেখে না, আগে দেখতো এবং সেজন্য নীলমণিবাবুকে সাধারণে খাতিরও করতো কিন্তু এখন পড়েছে স্বদেশীর যুগ, সুরেন বাঁড়ুজ্যে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়ে দিলে আর কি—এখন হাকিমের বাড়ি বেশি যাতায়াত নাকিতত সম্মানজনক নয়।

নীলমণিবাবু রাগের সুরে বল্লেন—মানে?

—মানে কাজের বড্ড আটা দেখাচ্ছিলে কিনা, তাই বলচি—

—তাতে তোমার কি?

—না, আমার কিছু না। সকলেই বলছিল তাই—

আমি একথা শুনেছিলাম রামজয়বাবুর ছেলে নীরদের মুখে, সে আমার সহপাঠী ছিল। লোকে যে যা বলুক, নীলমণিবাবু গ্রাহ্য করেন না। তিনি আজ পনেরো বছর ধরে এই হাকিম-তোষণের ফলে সরকারি হাসপাতালের কমিটির সদস্য, পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সহকারী সভাপতি, লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতি, চৌকিদারি কমিটির সদস্য প্রভৃতি বহু সম্মানজনক পদে গবর্নমেন্ট থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দানশীল বলেও তাঁর একটা খ্যাতি আছে, তবে ব্যাপারগুলো গবর্নমেন্ট ঘেঁষা হলেই তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। গবর্নমেন্ট দাতব্য হাসপাতালে একটা উইং বাড়ানোর জন্যে গবর্নমেন্টের হাতে তিনি সাড়ে চার হাজার টাকা সেদিন দিয়েচেন। এইরকম আরো অনেক আছে। তিনি গবর্নমেন্ট প্লীডারও বটে আজ আট-ন'বছর ধরে। গবর্নমেন্ট প্লীডার একটা কতবড় সম্মানজনক পদ, যদিও এই ছোট মহকুমা শহরে গবর্নমেন্ট প্লীডারের বিশেষ কাজ যে কিছু আছে তা নয়, তবে ওই যে বল্লাম একটা মস্ত সম্মান। সকলে তো গবর্নমেন্ট প্লীডার হতে পারে না। নীলমণিবাবুর ছাপানো চিঠির কাগজে লেখা আছে "এন.মল্লিক,বি. এল.—গবর্নমেন্ট প্লীডার।" সম্মানও তিনি পেয়ে এসেচেন খুব। দু-তিনটি স্থানীয় স্কুলের তিনিই হর্তাকর্তা। মোটা বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি হাতে করে যখন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরোন, তখন সকলেই সম্ভ্রমের সুরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। লোককে জব্দ করতেও তিনি অদ্বিতীয়, টুক করে কোথায় কি লাগালেন, তার পর দিন থেকে তার পেছনে পুলিশ লেগে গেল।

একটা উদাহরণ দিলে এখানে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

শহরের বাজারে রামনাথ দাঁ তখন বড় ব্যবসাদার। তার ছেলে শিবু খুব শৌখিন মেজাজের লোক,বড়লোকের অপদার্থ ছেলে যেমন হয়ে থাকে। মদ, গাঁজা, গুলি খায়— মাসের মধ্যে দশবার কলকাতায়

ছোটে ফুর্তি করবার জন্যে। বাপের পয়সা দু'হাতে ওড়ায়। রামনাথ দাঁ ওকে টাকা দিতো না, টাকা দিতো ওর ঠাকুরমা।

সেদিন নীলমনিবাবু বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেড়িয়ে ফিরচেন, ঠিক সেই সময় শিবু সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে তাঁদের বাড়ির দরজায় বসে বিড়ি টানচে। তিনি যখন খুব কাছে এসে পড়েচেন, তখনো বিড়ি ফেলে দেবার বা লুকিয়ে ফেলবার কোনো আগ্রহই তার দেখা গেল না, অথচ সে তাঁকে দেখতে পেয়েচে। নীলমণিবাবু আরো কাছে এসে পড়লেন, আর হাত বিশ-ত্রিশ দূর, তখনো শিবু বিড়ি খাচ্ছে। তারপর যখন একেবারে তার সঙ্গে একই সরলরেখায় এসে পড়লেন নীলমণিবাবু, তখন শিবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আধপোড়া বিড়ি সমেত হাতটা একবার পেছনদিকে নিয়ে গেল মাত্র।

রাগে ও অপমানে নীলমণিবাবুর আপাতমস্তক জ্বলে উঠলো।

এতবড় স্পর্ধা শিবু দাঁর!ওর বাপ রাস্তাঘাটে দেখা হলে মাথা নীচু করে প্রণাম করে, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়—আর ও কি না—

বজ্রগম্ভীর সুরে হেঁকে বললেন, এই শিবে—

শিবু বললে—আজ্ঞে, আমায় বলচেন?

তখনো সে রোয়াকে বসেই আছে।

—হ্যাঁ,তোমাকেই বলচি।

—বলুন।

নীলমণি বললেন—তুমি না কালকের ছেলে, গুরুজনদের সামনে কিভাবে চলতে হয় তোমার বোঝা উচিত।

শিবুর অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সে উত্তর করে বসলো—কেন, আমি কি করলাম? বারে! আপনি যাচ্চেন রাস্তা দিয়ে, আমি বসে আছিআমার বাড়িতে—কি দোষ হল এতে?

নীলমণি মল্লিকের স্বর অতিমাত্রায় কঠোর হয়ে পড়লো। বললেন—কি দোষ হয়েছে? দেখতে পাচ্চ না এখনো? আচ্ছা দেখতে পাবে।

শিবু ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। নীলমণিবাবু অধিকতর দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে এলেন।

এরপরে থানা থেকে দারোগা এসে রামনাথ দাঁয়ের বাড়ি সার্চ করলে, শিবুকে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। সে নাকি কি স্বদেশী হাঙ্গামায় জড়িত আছে। রামজয় বাঁড়ুজ্যে জামিনের দরখাস্ত করে নিরাশ হলেন। শিবু হাজতে দু-দিন দু-রাত কাঁটালে। শহরময় শোরগোল পড়ে গেল। এই সময় ঘুঘু রামজয় উকিলের পরামর্শে রামনাথ দাঁ গিয়ে নীলমণি মল্লিকের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। বাস, সব ঠাণ্ডা।

এ সব আমার স্কুল-জীবনের সমসাময়িক ব্যাপার।

তারপর নীলমণি মল্লিক আরো বড় হয়ে উঠলেন মহকুমা শহরে। সব সভাতেই তিনি, সব সমিতিতেই তিনি, সব প্রতিষ্ঠানের তিনি হর্তাকর্তা। গবর্নমেন্টের খেতাবও পেলেন নববর্ষের এক শুভদিনে। তিনি আরো উদার হয়ে উঠলেন, আরো দাতা হয়ে উঠলেন।

আমি তখন দেশে থাকি না। মহকুমা শহরটি তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যারা পদচারণ করে তাদের কোনো খবরই রাখি না।

বছর পনেরো পরে আবার দেশে ফিরে এলাম।

রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক অনেক প্রবীণ হয়ে পড়েচেন। শহরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, হাকিম-তোষণ নীতির একনিষ্ঠ সেবক নীলমণিবাবু কিন্তু আগের উচ্চস্তরে এখন যেন নেই লোকের চোখে। আমার সে স্কুলজীবনের দিনগুলির পরে ত্রিশ বছর কেটে গিয়েচে। এখনকার যারা তরুণ সম্প্রদায়, তারা দেখলুম ওঁকে আমল দেয় না।

দেশে ফিরে আসবার সময় মাস-দুই পরে এর এক প্রমাণ পেলাম।

সুরনাথ উকিলের বৈঠকখানায় বসে আছি, সেখানে ছোকরা উকিল শুভেন্দু গাঙ্গুলী এসে বসলো। খুব ধড়ফড় করে ইংরেজি বলে, ঘন ঘন সিগারেট ফোঁকে (তবে আমার সামনে না), কথায় কথায় হাসে। তার মুখেই শুনলাম সে এবার রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে হাই স্কুলের সেক্রেটারিত্বের ব্যাপারে নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে।

আমি অবাক।

এ কি কখনো সম্ভব? নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে টক্কর দিতে চলেচে তাঁর ছোট ছেলের বয়সী শুভেন্দু? যে নীলমণিবাবু আজ বিশ বছর ধরে স্কুলের সেক্রেটারি, তার সঙ্গে?

আমি বল্লাম—শুভেন্দু, এ সম্ভব হবে না। তুমি কার সঙ্গে লড়তে যাচ্চে, জানো?

শুভেন্দু বললে—আপনিই জানেন না দাদা। উনি আজ স্কুলটা গ্রাস করে বসে আছেন বিশ বছর। যেন সেকেলে ধরনের স্কুল চলচে, নিউ ব্লাড না ঢুকলে আর—

—কিন্তু তুমি পারবে?

—সেকাল আর নেই দাদা। আপনি বহুদিন দেশে ছিলেন না। ওঁকে আর কেউ চায় না। ইয়ং দল ওঁর ঘোর বিপক্ষে। তা ছাড়া সকলেই ওঁকে ধামাধরা বলে থাকে। মুন্সেফ ডেপুটিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চা খেয়ে বেড়ালে যে সম্মান একদিন পাওয়া যেতো, এখন তার পরিবর্তে পাওয়া যায় ঘৃণা। আগে বলতো, অমুক বাবু হাকিমের ডান-হাত বাঁ-হাত, অতএব ওঁকে খাতির করো। এখন বলে,ও সেকেলে মেন্টালিটির লোক, খোশামুদে। ওঁর সব শেষ হয়ে গিয়েচে। ওঁর দ্বারা আর কি হবে? নিউ ব্লাড চাই দাদা, নিউ ব্লাড চাই।

—তোমাকে ভোট দেবে সবাই?

—দেখুন কি হয়। আপনি জানেন না।

শুভেন্দু উঠে গেল। আমি সুরনাথ উকিলকে বল্লাম—শুভেন্দু বলে কি হে? ও পারবে নীলমণি কাকার সঙ্গে?

সুরনাথবল্লে—নীলমণিবাবুর দিন চলে গিয়েচে। এখন সকলে ওঁকে আড়ালে ঠাট্টা করে।

—বল কি হে?

—তাই। ওঁর সমসাময়িক উকিল আর কেউ নেই এক হৃদয় চক্কত্তি ছাড়া। তা হৃদয় চক্কত্তি আজ প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন দশ বছর। পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আমাদের রায়বাহাদুর এখনো দু'বেলা সেই রকম ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে যান পাম্পশু পরে, সিগারেট খেতে খেতে। লাইফ অ্যান ওল্ড স্নব্ দ্যাট হি ইজ—হি হি—

রাস্তায় নেমে একটু দূর গিয়েই রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা।

শীতকাল। দামি জামিয়ার গায়ে দিয়ে মলক্কা বেতের ছড়ি উলটো করে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি পঁচিশ বছরের যুবকের দর্পে ও তেজে পথ চলচেন। আজকালকার যুবক নয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবক, যাদের চোখে ছিল শেষ ভিক্টোরিয়া যুগের মোহ-অঞ্জন, নিশ্চিন্ত ব্রিটিশ-প্রীতি, ব্রিটিশ জাস্টিসের প্রতি অগাধ ও অটুট বিশ্বাস।

আমায় অনেক দিন পরে দেখেও কিন্তু নীলমণি কাকা কথা বল্লেন না।

কেননা আমি 'কমনার্',তাঁর সেটের লোক নই।

তিনি আমায় খুব ভালো জানেন, আমার বালক-কাল থেকে দেখে আসচেন আমাকে। কিন্তু ওই যে বল্লাম, ওই এক ধরনের লোক থাকে—ওল্ড স্নবই বটে, পয়লা নম্বরের স্নব, নাক-উঁচু লোক।।

আমি হৃদ্যতার সুরে বল্লাম—কাকা ভালো আছেন? অনেক দিন পরে দেখলাম আপনাকে—

—হুঁ।

—জ্ঞান আজকাল কোথায় আছে?

—কলকাতায়।

—ব্যস—আমার অযথা ঘনিষ্ঠতা করবার প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই নির্মূল করে দিয়ে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক উলটো-করে-ধরা মলক্কা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেলেন।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

আমার কষ্ট হল। পিতার বয়সী লোক, এ সব মানুষ জানে না যে যুগ বদলে যাচ্চে ওদের চোখের ওপরে। কিছুই দেখে না—দেখেও দেখে না।

স্কুলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নীলমণিবাবু হেরে গেলেন। হেরে গিয়েও নির্বাচন ব্যাপারের কি একটা খুঁৎ ধরে তিনি আবার এক মোকদ্দমা করলেন তাতেও হেরে গেলেন।

গত ত্রিশ বৎসরে এই ক্ষুদ্র শহরটির বুকে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক এক-একখানি করে ইট বসিয়ে সম্ভ্রমের যে বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, আজ এক অর্বাচীন যুবকের হাতের আঙুলের এক ধাক্কায় তা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এর পর থেকে কি যে হল, বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব একে একে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যে লাইব্রেরির জন্যে তিনি কত কৌশলে চাঁদা আদায় করে, গবর্নমেন্টের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্য বার করে বর্তমান পাকাবাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই লাইব্রেরির কমিটির মধ্যেও তাঁর নাম আর রইল না। অথচ তিনি ঐ কমিটির সহকারী সভাপতি ছিলেন গত পনেরো বছর যাবৎ। সভাপতি অবিশ্যি ছিলেন মহকুমার হাকিম, সে-ও রায় বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমেই। হাকিম, মুন্সেফ, সরকারি ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি যাতে সন্ধ্যার সময় এসে লাইব্রেরিতে তাস খেলতে পারেন, তার সুবন্দোবস্তও করে রেখেছিলেন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর বলতেন—আরে ওরা আসা ভালো, এতে লাইব্রেরির প্রেস্টিজ বাড়ে। দরকার হলে দু'পয়সা সাহায্য দেবার মালিক তো ওরাই।

এই লাইব্রেরিতে কতবার বদলির আদেশপ্রাপ্ত হাকিমদের বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হয়েচে, তাদের হিসেব ওর প্রত্যেকখানা ইটে লেখা থাকলে সব ইট ভর্তি হয়ে যেত আজ। শুধু কি হাকিম, তা হলেও তো কথা ছিল। কি সমাচার, সরকারি ডাক্তার বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। কি সমাচার, ছোট দারোগা বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। বিদায়-সভার চাঁদার চোটে লোকে বিরক্ত। এ সব আগে আগে ঘটে গিয়েচে, তখন তিনি ছিলেন শহরের নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনেকের ভীতির স্থল। সুতরাং লোকে দিয়েচেও বিনা কৈফিয়তে।

জেলার শহর থেকে জজসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছেন, নীলমণিবাবু পূর্বাহ্ন খবর পেয়ে গেলেন, তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই জজসাহেব মোটরে যাবেন কলকাতায়। অমনি একঘন্টার মধ্যে বিদায়-সভার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললেন। গেট সাজানো হল নীলমণিবাবুর বাড়ির সামনে, সভার অনুষ্ঠান হল ওঁর বৈঠকখানা বারান্দায়। সিঙ্গাড়া, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, চা, ফুলের মালা, গান, কোনো কিছুরই ত্রুটি হল না। সব খরচ বহন করলেন অবিশ্যি তিনি নিজেই।

রামজয় বাঁড়ুজ্যের দল বল্লে—অস্তগামী সূর্যের পুজোয় কি হবে ভায়া? ও যখন চলে যাচ্ছে তখন থাক না। ওদের সম্মান দেখানো তো ওদের ব্যক্তিগত মেরিটের জন্যে নয়, পদের জন্যে। সে পদ ছেড়ে সে যখন চললো, তখন আর কেন?

নীলমণিবাবুর প্রায় একশো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, এ সব খরচের বেলা তিনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। এ সব সেকালের কথা নয়, সেদিনের কথা।

হঠাৎ কিন্তু দিন বদলে গেল আশ্চর্যভাবে। কয়েক বছরের মধ্যে কি রকম একটা হাওয়া এসে ঢুকলো শহরে। ছেলে-ছোকরার দল সব বিষয়ে এগিয়ে এসে হল পান্ডা। লাইব্রেরি তারা দখল করলে, বললে—বুড়োদের দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। একখানা আধুনিক কালের বই নেই—সব সেকেলে। শুধু হাকিমহুকুমদের তাসখেলার আড্ডা হয়ে রয়েচে লাইব্রেরি আজ বিশ বছর ধরে। এ অচলায়তন আমরা ভাঙবো।

তারা নিজেদের মধ্যে দল পাকিয়ে হৈ-হৈ করে ছাপানো কাগজ শহরময় বিলি করে জানিয়ে দিলে—শহরের সব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা জং-ধরা প্রাচীন ফসিলদের তাড়িয়ে নিজেরা ঢুকে পড়বে। তাড়ালেও তারা। লাইব্রেরিতে এক কংগ্রেসী সভা করতেই হাকিমের দল সরে দাঁড়ালো—তাসের আড্ডা হাওয়া হয়ে গেল। তারপর ধরলে এক সাহিত্যসভা—কলকাতা থেকে নবীনপন্থী প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদল এলেন। তাঁদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শহরময় শোভাযাত্রা বার করা হল—বহু প্রবন্ধপাঠ, বহু বক্তৃতাদান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল। দেশের স্বাধীনতা নিয়েও অনেক কথাবার্তা হল সে সভায়।

রায়বাহাদুর সে সভার ত্রিসীমানায় পা দেননি। কিন্তু যত দিন যায়, তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন,কিছু বুঝতে পারেন না। এ সব কি দিন এসে গেল? ছেলে-ছোকরার দল আর তাঁকে দেখে সম্ভ্রম করে না, হাকিম পুলিশ পেয়াদা আরদালিদেরও আর যেন সুদিন নেই, কোথায় সেই সব রক্তচক্ষু দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাকিমের দল সেকালের? সব যেন মিইয়ে গেল। নইলে মুন্সেফবাবু এখন সুরনাথবাবুদের ক্লাবে বসে আড্ডা দেন। মনে পড়ে সেকালের মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির কথা। এখনো অনেকে তাঁকে মনে রেখেচে বৃদ্ধদের মধ্যে। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো তাঁর প্রতাপে। কারো বাড়ি যেতেন না, কোর্টের বাইরে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতেন না। নীলমণিবাবুর বড় মেয়ের বিবাহে কাপড় মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের মারফত—নিজে আসেননি।

পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে নীলমণিবাবু ডেপুটিবাবুর বাংলোয় গেলেন কাপড় মিষ্টি পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ দিতে। বললেন—আপনি গেলেন না কাল হুজুর, কাল সকলেই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—সেটা আমার ত্রুটি নিশ্চয়ই, আমি স্বীকার করি।

—না, হুজুরের ত্রুটি হয়েচে তা কি বলতে পারি, তা নয়—

—না না, ত্রুটি নিশ্চয়ই। তবে কি জানেন নীলমণিবাবু, এখানে আমি সামাজিক জীব নই, গবর্নমেন্টের কর্মচারী। আমাকে নিমন্ত্রণ না করাই আপনাদের উচিত।

—সে কি কথা বলচেন আপনি—তা কি কখনো—

—আমি ঠিকই বলচি নীলমণিবাবু। ভবিষ্যতে আপনার বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে আর আমাকে নিমন্ত্রণ না করলেই আমি সুখী হবো। কারণ এতে আমায় লজ্জায় ফেলা হয় মাত্র।

সরল সোজা কথা। তেমন ধরনের লোক আর আসে না। সব যেন মিইয়ে গিয়েচে।

তারপর কিছুকাল কেটে গেল।

রায়বাহাদুরের অস্তিত্ব যেন এ শহর ভুলে গিয়েচে। কোনো অনুষ্ঠানেই আর তিনি কর্মকর্তা নন, কোনো সভার সভাপতি নন। কেউ তাঁর কাছে যায় না কোনো বড় কাজের পরামর্শ নিতে। একদিন যাঁর পরামর্শ ভিন্ন এ শহরের লোকের চলতো না, আজ তাঁকে বাদ দিয়েও লোকের দিব্যি চলচে।

রামজয় বাঁড়ুজ্যে মারা গিয়েচেন, রায়বাহাদুরের সমসাময়িক উকিলদের মধ্যে দু-একজন মাত্র জীবিত আছেন। নীলমণিবাবুও কোর্টে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন। তবে ছড়ি ঘুরিয়ে এখনো ভ্রমণে বার হয়ে থাকেন সেকালের মতো।

চৈত্র মাসের প্রথমে এবার আমি অনেকদিন পরে মহকুমার শহরে গেলাম। তখন শহরে জেলার ছাত্র-সম্মেলন হবার বিরাট তোড়জোড় চলচে। একদিন সকালে নীলমণিবাবুর সঙ্গে দেখা রাস্তায়। বৃদ্ধ ছড়ি ঘুরিয়ে

পথে চলেচেন আগেকার মতোই। আগেকার সুচেহারা আর নেই, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হল, জরার অধিকারের চিহ্ন সারাদেহে। আমি কথা বল্লেও উনি কথা বলবেন না জানি, কারণ আমি ছেলে খেপিয়ে বেড়াই উনি জানেন এবং বোধ হয় সেজন্যেই আমায় পছন্দ করেন না। পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কোনো কথা বল্লেন না আমার সঙ্গে। আমার সামনে এসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ছাত্রের দল আমার কাছে এল ওদের সম্মেলন সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি তাদের বল্লাম, আমার অনুরোধ এবার নীলমণিবাবুকে সম্মেলনের সভাপতি করতে হবে।

তারা বল্লে—আপনি কি বলচেন? উনি সভাপতি হলে লোকে কি বলবে?

—যে যাই বলুক, তোমরা ওঁকেই সভাপতি করো। উনি আর ক'দিন? অনেক কিছু উনি করেচেন একসময়ে এই শহরের জন্যে। যে সব আজ লোকে ভুলে গিয়েচে। ওঁর সম্মান ওঁকে দাও। এ কথা তোমাদের রাখতেই হবে।

বহুকষ্টে ওদের রাজি করিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে আমি নিজে ওদের নিয়ে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা। রায়বাহাদুর বৈঠকখানায় বসে ওঁর মুহুরি জীবন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াতেই বল্লেন—কে?

—আজ্ঞে কাকাবাবু আমি।

—ও, এসো। কি মনে করে।

আমার ইঙ্গিতে ছাত্রের দল এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়ালো। তারপর ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরের পায়ে হাত দিয়ে এরা প্রণাম করলে। বিস্মিত রায়বাহাদুর কিছু বলবার পূর্বে আমি বললাম—কাকাবাবু, এরা আপনার কাছে এসেচে, এদের ছাত্র কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হবে কাল এখানে— আপনার কাছে আসতে তো সাহসই করছিল না, আমি ওদের বল্লাম—চলো নিয়ে যাচ্চি, কোনো ভয় নেই, তিনি ছাড়া উপযুক্ত লোক আর আছেই বা কে এখানে? তাই এরা এসেচে, আপনাকে কাল ওদের সম্মেলনে প্রিজাইড করতে হবে। আপনাকে রাজি হতেই হবে, নিরাশ করবেন না। আমি জানি আপনি খুব বিজি লোক, কিন্তু এদেরও তো একটা দাবি আছে আপনার ওপর—

রায়বাহাদুর চমকিত, অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যেন তাঁর মুখে কথা বার হল না।

ছাত্রদের চাঁই সুধীর অমনি হাতজোড় করে বল্লে—আমাদের নিরাশ করবেন না স্যার, আপনি ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত লোক নেই এখানে—

— বেশ, বেশ। তা হবে। বোসো বোসো তোমরা—

রায়বাহাদুর অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—ওহে নরেন, বোসো বাবা বোসো—সে সব হবে এখন, তুমি যখন নিজে এসেচ তখন আর 'না' বলতে পারিনে। একটু চা খাও সব, বোসো—ওরে শোন—ও হৃদে—আচ্ছা সব বোসো, আমি বাড়ির মধ্যে থেকে আসচি—এক মিনিট—

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জন্যে বেশ ভালো জলখাবার এল, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, পেঁপেকাটা ইত্যাদি। ছাত্রেরা জলখাবার খেয়েই চলে গেল, তারা কেউ চা খাবে না।আমাকে একা পেয়ে রায়বাহাদুর নিজের বহু পূর্ব কীর্তির কথা প্রাণভরে আমার কাছে বলে গেলেন। এ শহরে কিছুই ছিল না—না লাইব্রেরি, না বালিকা বিদ্যালয় না প্রসূতি ভবন। যা কিছু করেচেন, তিনিই করেচেন। ডেপুটি মুন্সেফবাবুরা তাঁকে খাতির করতেন কত। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর বাড়ি এসে চা খেয়েচেন। আজই এখানকার লোকে তাঁকে পৌঁছে না।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—আপনাকে চিনবে কে, জানবে কে কাকাবাবু? সবাই কি সকলকে জানতে পারে? ওরা আমায় বল্লে আপনার কথা। সাহসই পায় না এগোতে। বলে, অত বড় লোক কি আমাদের সভায় প্রিজাইড করতে রাজি হবেন? আসতে চায় সবাই, আসতে ভয় পায়—

—বোসো বোসো বাবা, উঠচো কেন? আর একটু চা খাবে না?

—আজ্ঞে না কাকাবাবু। অনেক কাজ আছে, উঠি। আপনার মতো লোককে নিয়ে যেতে হলে তার উপযুক্ত তোড়জোড় করতে হবে তো? আশীর্বাদ করুন যেন ওরা সফল হয়—

আমরা পরদিন ওঁকে মস্ত বড় শোভাযাত্রা করে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সভাস্থলে নিয়ে গেলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে কেউ তাঁকে ডাকেনি। বিস্মৃত, উপেক্ষিত রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের বহুদিনের অজ্ঞাতবাস মহাসমারোহে আমরা ভঙ্গ করলাম। সভায় অনেক ভালো ভালো লোক এসেছিলেন, জেলা ছাত্র কংগ্রেসের বিরাট সভা, যথেষ্ট আয়োজন, যথেষ্ট আড়ম্বর। বন্দেমাতরম গান হল, জয় হিন্দ গান হল। রায়বাহাদুর মুগ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন! সেক্রেটারি তার রিপোর্টে রায়বাহাদুরের যথেষ্ট প্রশংসা করে বললে, এ জেলায় তাঁর মতো বদান্য, উদার, দেশহিতৈষী লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রায়বাহাদুর এই সর্বপ্রথম জীবনে প্রকাশ্য সভায় দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মহাত্মাজীর প্রশংসা করলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় তাঁর বচন স্খলিত হতে লাগলো উত্তেজনায়। আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—ইনি কি সেই নীলমণি মল্লিক?

ভাষণের শেষে ঘোষণা করলেন ছাত্রসংঘের তহবিলে পাঁচশো টাকা তিনি দেবেন।

রায়বাহাদুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সকলে বলতে লাগলো—লোকটার মধ্যে জিনিস ছিল।

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা। বেতের ছড়ি ঘুরিয়ে রায়বাহাদুর সদর্পে পথ চলেচেন। আমায় দেখে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন—কোথায় চললে বাবাজি? বেড়াতে? বেশ বেশ। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয়। জেলার একটি রত্ন তুমি। তোমার বাবা—

হঠাৎ আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর।